মা

মা

ম্যাক্সিম্ গোর্কি

অনুবাদ
পুষ্পময়ী বসু

ভূমিকা ◆ সম্পাদনা

ড. শামস্ আল্‌দীন
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

শব্দাঙ্গন

প্রথম শব্দশৈলী সংস্করণ : নভেম্বর ২০২৪

মা

ম্যাক্সিম্ গোর্কি

প্রচ্ছদ : আল নোমান

© লেখক

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN : 978-984-687-006-0

শব্দাঙ্গন-এর পক্ষে ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৭৭৭৬২৪০৯০ থেকে ইতিয়া আমিন কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল কাদের প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত। বর্ণ বিন্যাস- শব্দশৈলী কম্পিউটার।

একমাত্র পরিবেশক : শব্দশৈলী, ৩৮/৪ মান্নান মার্কেট, ৩য় তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০, ফোন : ০২-২২৬৬৩৭৯০৫

The Mother
By
Maxim Gorky

Published by Eitiya Amin
Shobdanggon, 38/4, Banglabazar Dhaka-1100
অনলাইলে পেতে : www.facebook.com/shobdoshoily
ই-মেইল : shobdanggon2020@gmail.com
অথবা ফোন করুন: 16297

মূল্য : ৫০০ টাকা
$: 15

সূচিপত্র

ভূমিকা ॥ ৭
জীবনপঞ্জি ॥ ১৭
সংক্ষেপে উল্লেখযোগ্য রচনাপঞ্জি ॥ ১৯

মা
প্রথম খণ্ড ॥ ২১-১৮১
দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ১৮৩-৩৭২

পরিশিষ্ট
মুখবন্ধ : পথের তাঁর শেষ নেই ॥ ৩৭৩
গোর্কির 'মা' উপন্যাস লেখা হয়েছিল যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ॥ ৩৮০

ভূমিকা

আমাদের জানা মতে, পৃথিবীর সবচেয়ে পঠিত ও বিক্রিত উপন্যাসের নাম 'মা'। 'পাভেল' নাম্নী এক যুবকের সন্ধান পাওয়া যায় সকল দেশ, সকল ভাষাভাষী ও সকল ধর্ম সম্প্রদায়ে। পাভেল জনপ্রিয় ও পরিচিত এক নাম। তবে অনেকেরই ধারণা নেই, 'মা' উপন্যাসের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র পাভেলের নামানুসারে অনেকেরই নাম রাখা হয়ে থাকে। এ কারণেই 'মা' উপন্যাসের বিস্তৃত প্রভাব পৃথিবীব্যাপী। আরও একটি কারণে 'মা' উপন্যাসের গুরুত্ব বেড়েছে, পৃথিবীর অনেক মানুষ যারা শোষিত ও বঞ্চিত তাদের মুক্তির লড়াইয়ে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে 'মা' উপন্যাসের ভূমিকা অনস্বীকার্য' এবং সে ধারা বর্তমানেও বহমান। অন্যান্য ও শৈল্পিক বিবেচনাতেও উপন্যাসটি রুশসহ সারা পৃথিবীর সাহিত্য প্রেমীদের পাঠ করতে হয়। ১৯০৬-০৭ সালে রচিত এ উপন্যাসটিকে সাহিত্যিক মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মূলত 'মা' উপন্যাসের মধ্য দিয়েই সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সাহিত্যকর্মের সূত্রপাত হয়। আসলে সাহিত্য যে সমাজ সংস্কারের অন্যতম হাতিয়ার 'মা' উপন্যাস প্রকাশের আগে অনেকেই তা বুঝতেন না। এর অনুবাদ পৃথিবীর সব ভাষাতেই প্রায় পুনর্মূদ্রিত হয়েছে বলে সেটাকেও অন্যতম পরিমাপক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়াও 'মা' উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব তার নাট্যরূপ দেওয়া ও মঞ্চস্থ করার বিশাল আয়োজনের মধ্যেও অনুভব করা যায়। ১৯১৯ সালে 'মা' উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন আ-বাজুমনি। ফ্সেভলোৎ পুদোফ্কিন্ তৈরি করেন ১৯২৬ সালে। প্রধান অভিনেতা ছিলেন মস্কো আর্ট থিয়েটারের অন্যতম ব্যক্তিত্ব স্তানিস্লভোস্কি ও তার একাধিক শিষ্য। ফ্সেভলোৎ পূদোফ্কিন নিজে অভিনয় করে অনেকেই বিস্মিত করে দিয়েছিলেন।

'মা' উপন্যাস অবলম্বনে ১৯৫৮ সালে চলচ্চিত্রটি আন্তর্জাতিক মূল্যায়নে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ১২টি ছবির মধ্যে একটি বিবেচিত হয়। পরে ১৯৫৫ সালে কলকাতা ও ১৯৬৭ সালে ঢাকায় মঞ্চস্থ হয়। কলকাতার মঞ্চে মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বিখ্যাত অভিনেত্রী মলিনা দেবী। পরে ঢাকার মঞ্চে যারা

ছিলেন তাদের মধ্যে ‘মা’ উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন সাংবাদিক মোজাম্মেল হোসেন মন্টু এবং মোহাম্মদ সোলায়মান হোসেন। নাট্য পরিচালনায় ছিলেন চলচ্চিত্র অভিনেতা খান আতাউর রহমান ও সৈয়দ হাসান ইমাম। ‘মা’ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রওশন জামিল। এছাড়া বিখ্যাত অভিনেতা আনোয়ার হোসেন, গোলাম মোস্তফা, আবুল হায়াত, ইনামুল হক প্রমুখ। ‘পাভেল’ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন আনোয়ার হোসেন। একজন ‘মা’ সারা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের ‘মা’ হয়ে উঠেছেন একজন ম্যাক্সিম গোর্কির রচনায়। একজন লেখকের সার্থকতা এখানেই। ম্যাক্সিম গোর্কি একজন কালজয়ী কথাসাহিত্যিক। অন্যতম কেন্দ্রিয় চরিত্র ‘মা’ উপন্যাসের পাভেলের ভূমিকা এক্ষেত্রে গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

ম্যাক্সিম গোর্কি প্রসঙ্গেঃ

ম্যাক্সিম গোর্কির জন্ম ১৮৬৮ সালের ১৬ মার্চ (বর্তমান হিসাবে ২৮ মার্চ) মধ্য রাশিয়ার ভলগা নদীর তীরবর্তী নিঝ্নি নভগোরদ্ শহরে। (গোর্কির জন্ম তারিখ ২৮ মার্চ হওয়ার বর্তমান হিসাবে, কারণ সে সময় রুশ দেশে ব্যবহৃত জুলিয়ান পঞ্জিকা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী খ্রিষ্টাব্দ গণনায় গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকা থেকে ১২ দিন পিছিয়ে ছিল।) তার আসল নাম আলেক্সিয়েই মাক্সিমোভিচ পেশকভ। তিনি নিজেই ম্যাক্সিম গোর্কি ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। এ নাম তিনি লেখক জীবনের শুরু থেকেই ব্যবহার করতেন। সে জন্যই বিশ্বব্যাপী তার এ নামেই পরিচয়। গোর্কি পেশ্কভ্ বংশের ম্যাক্সিমের পুত্র। রাশিয়ার একটি শহরের নাম গোর্কি, সেটিই গোর্কির জন্মস্থান। গোর্কির জন্মের আগে ও পরে কত মানুষই এই শহরে জন্ম গ্রহণ করেন কিন্তু গোর্কিই এই শহরটিকে করেছেন গৌরবান্বিত।

গোর্কির বাবা ম্যাক্সিম সাভ্ভাতেভ্চি পেশক্ভ। মা ভার্ভারা ভাসিলিয়েভ্না পেশক্ভ। তার বাবা ছিলেন আস্ত্রাখান শহরের স্টিমশিপ কারখানার ছুতারমিস্ত্রি। গোর্কির বয়স যখন চার তখন কলেরায় আক্রান্ত হয়ে পিতার মৃত্যু হয়। মাত্র একত্রিশ বছর বয়সেই তার বাবার মৃত্যু হয়। তখন সহায়সম্বলহীন মা দুই সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়িতে ফিরে আসতে বাধ্য হন। স্টিমারে করে বাবার বাড়িতে আসতে গিয়ে পথিমধ্যে ছোট ছেলে ম্যাক্সিম মারা যায়। বেঁচে থাকেন তার মা ও গোর্কি। ফলে গোর্কির কৈশোরের বড় একটা সময় কেটেছে নানাবাড়িতে। তার নানা ভাসিলি কাশিরিন তাকে কারণে অকারণে মারধর করতেন। বাড়িতে লেখাপড়ার কোন পরিবেশ ছিল না। অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। গোর্কি বাজে সঙ্গে পড়ে দু-একবার চুরির ঘটনাও ঘটিয়েছে। ফলে গোর্কির কেটেছে একটি অন্ধকারাময় কৈশোর।

গোর্কির বয়স যখন এগারো বছর তখন তার মা ভার্ভারা মারা যান (১৮৭৯)। ভার্ভারা বাবার বাড়ি থাকা অবস্থায় তার চেয়ে দশ বছরের ছোট অলস প্রকৃতির এক লোককে বিয়ে করেন। এ বিয়ে তার সুখের কারণ হয়নি মোটেও। গোর্কি তার সৎ বাবাকে মা মারা যাওয়ার আগেও সহ্য করতে পারেননি। অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন তিনি মায়ের দ্বিতীয় বিয়ের কারণে। মা মারা যাওয়ার পর তাঁর প্রতি অত্যাচার আরও বাড়তে থাকে এবং নানা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হলো গোর্কিকে। বিশাল পৃথিবীর পথে এগারো বছর বয়সে গোর্কি বেরিয়ে পড়েন। বাধ্য হয়ে ক্ষুধার তাড়নায় বহু ধরনের দৈহিক কাজ করতে শুরু করেন গোর্কি। কখনো মুচির দোকানে কর্মচারী, কখনো রুটির দোকানে, কখনো জুতোর কারখানায়, কখনো স্টিমারের কুলি, ঝাড়ুদারের কাজ কিংবা কোনো ফ্যাক্টরির শ্রমিক অথবা পিয়ন, কখনো জাহাজের রেস্টুরেন্টে থালা-বাসন মাজার কাজ করেছেন। এমনিভাবে চলতে থাকে তার জীবনযুদ্ধ। বাঁচার লড়াই। জাহাজে কাজ করার সময় অবসর পেলে তিনি পড়াশোনা করতেন। জাহাজের এক নিয়মিত যাত্রী তাকে বই পড়া ও লেখা শিখিয়েছিলেন। এখান থেকেই তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। ১৮৮৪ সালে গোর্কি কাজান শহরে যান এবং কিছু সহমর্মী বন্ধু পেয়ে যান। তিনি এ সময় রুশ সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের লেখা পড়তে থাকেন। বিশ্বসাহিত্যের জ্ঞানার্জনে ম্যানিফেস্টো ও মার্ক-এঙ্গেলসের রচনার সঙ্গে পরিচিত হন। এ সময় তিনি নিজের জীবনের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তখন তাকে বাঁচানোর জন্য পুলিশ স্থানীয় একটি চার্চের পাদ্রির হাতে তুলে দেন। কিন্তু পাদ্রির তার আচরণে তাকে ধর্মদ্রোহী আখ্যা দেন এবং ৭ বছর সে ধর্মীয় সম্প্রদায়ে কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবেন না সেই মর্মে চার্চ তাকে এই শাস্তি দেন। কিন্তু গোর্কি এতে কিছুই মনে করলেন না। এবং এরই মধ্যে তিনি ঈশ্বর বিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। জীবন যেখানে অনিশ্চিত সেখানে এসব নিয়ম খাটেনা। সারা পৃথিবীতে যার আপন বলে কেউ নেই।

১৮৮৮-১৮৯২ সাল পর্যন্ত ম্যাক্সিম গোর্কি রাশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘুরে বেড়ান। দুমুঠো খাবারের চেষ্টা করেন। সঞ্চয় হয় অভিজ্ঞতা। তার কাছে যেন জীবন খেলার পুতুল। যুগে যুগে এমন মানব সন্তানরাই পৃথিবীকে এগিয়ে দিয়েছে বহুদূর। এসব কিছুই পরে কাজে লেগেছিল সাহিত্য সৃষ্টিতে। 'কাকেশাস' নামের একটি দৈনিক পত্রিকায় ১৮৯২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর 'মাকার চুদ্রা' নামে একটি গল্প ছাপা হয়। গল্পটিতে তার জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার বর্ণনা থাকার ফলে গল্পটি বেশ সাড়া জাগিয়ে তোলে পাঠকের কাছে। এরই ফলে তার সাহিত্যিক জীবনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। গোর্কি তার

স্বপ্রদত্ত নাম। ‘গোর্কি’ শব্দের অর্থ ‘তিক্তস্বাদ’ বা ‘কটুস্বাদ’। নিজের বঞ্চিত জীবন থেকেই হয়তো তার এনাম গ্রহণ করা। এর পর থেকেই তিনি নিয়মিত পত্র পত্রিকায় লিখতে থাকেন। ‘শিকারি পাখির গান’, নামে এক কাব্যিক গদ্য তিনি রচনা করেন ১৮৯৫ সালে এবং এ গদ্যই তাকে রাতারাতি বিখ্যাত করে তোলে। এরই মধ্যে তিনি ১৮৯৬ সালে ‘চেলকাশ’ গল্পটি রচিত ও প্রকাশিত হয়। অবাক করা বিষয় গল্পটি রুশসাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্যে এক অসাধারণ সংযোজন। সমস্ত দুঃখের সাগর পাড়ি দিয়ে মাত্র ২৪ বছর বয়সে পৃথিবীর কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন, রূপান্তরিত হন অন্য মানুষে। ‘কেন লিখছি’ প্রবন্ধে গোর্কি জানিয়েছে, ‘নিজেদের শক্তি সম্পর্কে আমাদের আত্মাবিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে; সেই আত্মবিশ্বাস আসবে ক্রমাগত প্রতিকূলতাকে জয় করা এবং ইস্পাতদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির মধ্য দিয়ে। আপনাদের চারপাশের পরিমণ্ডল থেকে অতীতের কদর্য ইতিহাসকে মুছে ফেলতে হবে। অন্যথায় ‘পুরনো পৃথিবী’কে পরিত্যাগ করা কোনো মতেই সম্ভব নয়। যদি না সেই শক্তি আপনারা অর্জন করতে পারেন তবে পালা বদলের গান আপনাদের গলায় ফুটবে না।’

১৮৯৬ সালে গোর্কির বিবাহিত জীবন শুরু হয়। তার প্রথম স্ত্রী একাতেরিনা পাভেলভ্না। তিনি সুন্দরী ও মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। প্রুফ রিডারের কাজ করতেন সংবাদপত্রে। উভয়েই উভয়ের প্রেমে পড়ছিলেন। তাদের সাংসারিক জীবন সুখের হয়নি। পরস্পর থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিলেন। মঞ্চের অভিনয় সূত্রে গোর্কির প্রেমে পড়েন মস্কো আর্ট থিয়েটারের অভিনেত্রী ও বঙ্গভাষাবিদ্ মারিয়া ফিড দরভ্না আন্দ্রেইয়েভা। তিনি ছিলেন এক উচ্চপদস্থ রেলকর্মচারীর স্ত্রী। এছাড়া বল্‌শেভিক দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন তিনি। এ মহিলার সঙ্গেও দূরত্ব তৈরি হয় গোর্কির এবং ১৯২০ সালে তাদের বিচ্ছেদ হয়। গোর্কি মারিয়া বুভ্‌বার্স নামের এক বিধবা মহিলার প্রেমে পড়েন এবার। বিদূষী ও বল্‌শেভিক দলের জেলখাটা কর্মী ছিলেন ইনিও।

সাহিত্য কর্মের পাশাপাশি তিনি সাংবাদিকতা পেশায় যোগদান করেন ১৮৯৫ সালে। তার গল্প পড়ে সাহিত্যিক ভ্লাদিমির গালাক্তিওনভিচ করালিয়েন্‌ক মুগ্ধ হয়ে তাকে সাংবাদিকতা পেশায় উৎসাহিত করেন। তিনি নিজেও ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হিসেবে সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত হন। পরবর্তী সময় ১৯১৫ সালে তিনি নিজেই ‘লিয়েতপিস’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং ১৯২১ সালে তার সম্পাদনায় সোভিয়েত সাহিত্য পত্রিকা ‘ক্রাস্‌নায়া নোফ্’ (রক্তিম জমি) প্রকাশ হতে থাকে। ১৮৯৮ সালে ‘রেখাচিত্র ও গল্পাবলি’ দুই খণ্ডের গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়। প্রতি খণ্ডে ১০টি করে গল্প। ‘আর্ট বুর্জোয়া’ রাজানীর থিয়েটার সেন্টারে প্রথম অভিনীত হয় ১৯০২ সালের ১৯

মে। অভিনয়ে স্তানিস্লাভস্কি স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং নাটকটি ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। এর মধ্যেই তিনি রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলো পড়ে শেষ করেন। বালজাক, টর্গেনিয়েভ, টলস্টয়, গোগল, লেসকভ ও চেখভের সাহিত্যকর্ম তার পরিচিত হয়ে ওঠে। তিনি নিজের লেখার ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কে জানিয়েছেন, "আমার বয়স মাত্র পনেরো বছর। এই অল্প বয়সেই আমার লিখবার একটি শক্তি আত্মপ্রকাশ করেছে। এই প্রেরণার মূলে আছে আমার দারিদ্র পীড়িত ক্লান্তিকর জীবন।" ১৯০৫ সালে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন। তিনি ছিলেন বল্শেভিক পার্টির সদস্য। এর ফলে তিনি জার সরকারের দ্বারা নির্যাতিত হন। ১৯০৬ সালে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার কারণে রাশিয়ার ছেড়ে ফিনল্যান্ডে চলে যান। পরে সুইজারল্যান্ডে হয়ে আমেরিকায়। এবং সেখানেই তিনি অবিস্মরণীয় 'মা' উপন্যাসটি রচনা করেন। ম্যাক্সিম গোর্কিকে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহিত্যজগতে মুকুটহীন সম্রাট বলা হয়। 'মা' উপন্যাস ঘিরে তিনি ব্যাপকভাবে আলোচিত হন।

শেষ জীবনে ম্যাক্সিম গোর্কি যক্ষারোগে আক্রান্ত হন। ১৯৩৬ সালের ১৮ জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন, তার আগে ১৫ বছর যক্ষাক্রান্ত ছিলেন। তিনি ডাক্তারদের চিকিৎসায় থাকাকালীন অবস্থায় মারা যান। অবশ্য সোভিয়েত সরকার ডাক্তারদের বিরুদ্ধে বিষ প্রয়োগের অভিযোগ এনে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সারির কয়েকজন নেতারও মৃত্যুদণ্ড হয়। অনেকেই ধারণা করেন স্তালিনের ইঙ্গিতেই এ ঘটনা ঘটেছে।

'মা' উপন্যাসের অনুবাদ প্রসঙ্গেঃ

একজন লেখককে সমাজে পরিচয় করান সাহিত্য পাঠক ও সমালোচকবৃন্দ। 'মা' উপন্যাসটিকে পশ্চিমা সমালোচকবৃন্দ ভালোবোধে গ্রহণ করেননি বরং উপেক্ষা করেছেন বিনাদ্বিধায়, কিন্তু উল্টো চিত্র মার্কসবাদী সমালোচকগণের কাছে 'মা' উপন্যাস নিয়ে। তারা সাদরে গ্রহণ করেছে উপন্যাসটিকে। বাঙালি সমাজে বা পাঠকের কাছে উপন্যাসটি সমাদর পায় বাংলায় অনূদিত হওয়ার পরে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যয় প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন 'মা' উপন্যাসের এ কথা অনায়েসেই বলা যায়, ১৯৩৩ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর বাঙালি পাঠকের কাছে তা সবচেয়ে বেশি সমাদৃত হয়। উপন্যাসটির বাংলা অনুবাদ বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। 'মা' উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ কাজী নজরুল ইসলাম পরিচালিত 'লাঙ্গল' পত্রিকায় অল্প অল্প করে প্রকাশিত হত। এটি ছিল লেবার স্বরাজ পার্টির মুখপত্র। বেশ কিছুদিন পর অনুবাদ প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় পত্রিকাটিতে। 'লাঙ্গল' নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে অর্থনৈতিক

মূল্যায়ন করতে না পারার কারণে তিনি আর লেখা (অনুবাদ) পাঠাতেন না। এর কিছুদিন পর সুরেশ বিশ্বাস অনুবাদ করে পাঠাতেন এর পর 'মা' উপন্যাসের অনুবাদক হিসেবে বিমল সেনের নাম পাওয়া যায়। অনুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য বিভিন্ন প্রকাশককে আমরা এগিয়ে আসতে দেখি। ১৯৪৩ সালে 'ন্যাশনাল লাইব্রেরি' গ্রন্থাকারে 'মা' উপন্যাসটি প্রকাশ করে। 'গুপ্ত ফ্রেন্ডস এন্ড কোং' পরবর্তীতে প্রকাশ করে।

পরবর্তী সময়ে ১৯৫৪ সালে অশোক গুহ ও পুস্পময়ী বসু দুজনের অনুবাদ প্রকাশ করে ন্যাশাল লাইব্রেরিতে ও ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লি.। জানা যায় গ্রন্থটি মূল রুশ ভাষা থেকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন মার্গারেট ওয়েটলিন এবং ইংরেজি অনুবাদ অনুসরণে সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ করেন অশোক গুহ ও পুস্পময়ী বসু। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন খালেদ চৌধুরী। তবে পরবর্তীকালে জানা যায় পুষ্পময়ী বসুর ইংরেজি অনুবাদ অনুসরণ বাংলা অনুবাদটি মস্কোর Foreign language publishing house প্রকাশ করেছিল। বাংলা অনুবাদক হিসাবে পুষ্পময়ীর নামে গোর্কির 'মা' উপন্যাসটি প্রকাশ করেন পরবর্তী প্রকাশক গ্রগতি প্রকাশন। এছাড়া ধীরেন্দ্রলাল ধরের নামে ১৯৬৮ বিমল দত্তের নামে ১৯৭১ এবং ১৯৭২ সালে ইন্দুভূষণের নাম পাওয়া যায়। অধ্যাপক নিখিলেশ গুহের সম্পাদনায় 'মা' গ্রন্থটি প্রকাশ করে 'রিফেলক্ট পাবলিকেশন'। 'মা' উপন্যাসটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। উপন্যাসটির বিষয়বস্তু হলো মা পেলাগেয়া নিলভনা ভলাসভ-এর বিয়ে হয় এক মাতাল শ্রমিকের সাথে। এ সময় তার বয়স চল্লিশ বছর। বেশ কিছুদিন পর তার স্বামী তাকে ও ছেলে পাভেল মিখাইলাভিচ ভগাসভকে রেখে মারা যান। মা'র সন্দেহ হয় ছেলে মনে হয় কোনো দলের সাথে মিশে গেছে। মা বিস্ময়ের সাথে দেখেন বাড়িতে পাভেলের বন্ধুবান্ধবরা এসে জড়ো হয় প্রায়ই। তারা জীবন বদলের রাজনৈতিক আলোচনায় মেতে ওঠে। মা অল্প সময়ের মধ্যেই এদের রাজনৈতিক আদর্শ সম্পর্কে জেনে যায়। তারা জীবন গড়ার রাষ্ট্র কাঠামোর পরিবর্তন চাইছে দৃঢ়ভাবে। এদের আত্মপ্রত্যয় দেখে মা'র দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। অসহায় শ্রমিকরা কীভাবে বিপ্লবের মধ্যে ভাগ্য পরিবর্তন করে তা এই উপন্যাস পড়লে জানা ও বোঝা যায়। ম্যাক্সিম গোর্কি অসাধারণ দক্ষতায় সঙ্গে দেখিয়েছেন পুঁজিবাদী সমাজে শিল্পের বিকাশ হলেও জীবন হয় জটিল ও দুঃসহ। আর এ অবস্থা থেকে মুক্তির স্বাদ অনুভব করায় 'মা' উপন্যাসটি।

ম্যাক্সিম গোর্কি মূলত জালোমোভ ও তার মায়ের সান্নিধ্যে এসেই 'মা' উপন্যাসটি লিখতে পেরেছিলেন। গোর্কি 'মা' চরিত্রে তার নানিকে যেন এবং জালোমোভের 'মা' আন্না কিরিলোভনার মানবিক আচরণের প্রতিফলন ঘটেছে।

গোর্কির মায়ের দূর সম্পর্কের আত্মীয় কিরিলোভনা। তিনি প্রায়ই গোর্কির নানার বাড়িতে আসতেন। বিধবা ছিলেন তিনি। তার স্বামী এক কারখানায় কাজ করতেন। তিনি মাতলামি করতে করতে মারা যান। ফলে তার স্থানে শ্রমিক হিসেবে যোগ দেন তার ছেলে জালোমোভ। সে কারখানাতে যোগ দিয়েই শ্রমিকদের সংগঠিত করতে থাকেন। এক সময় তার দণ্ড নির্বাসন হয়। তার অনুপস্থিতিতে মা কিরিলোভনা সরমভোর আন্দোলনে নেতৃত্বে দেন। মায়ের যে ত্যাগ, যিনি ছেলের স্নেহ-মমতায় ও আদর্শের টানে অকুতোভয়ে আন্দোলনে নেতৃত্বে দিয়েছেন এবং তারই প্রতিফলন ঘটেছে 'মা' উপন্যাসের মা চরিত্রে। গোর্কিও তখন জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলায় কারাবন্দি ছিলেন। তখন গোর্কির মা-ই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

মা কীভাবে এ সমস্ত বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হন তা দ্বিতীয় খণ্ডে দেখানো হয়েছে। বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষক নিকোলাই ইভানভিচের সংস্পর্শে এসেই তিনি শ্রমিক সংগঠনে যোগ দেন এবং গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসেন। তিনি এখানে সহযোগী হিসেবে পান নিকোলাইয়ের বিধবা বোন সোফিয়াকে। পাভেলের অনুপস্থিতে পাভেলের 'মা' আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে লিফলেট বিলি করার সময় বন্দি হন এবং বন্দি অবস্থায় বক্তৃতাদানের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের শেষ হয়। বিশ্বে নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটাকে সাহিত্যসূত্র বলে ধরা হয়। সন্তানের মায়ার রাজনীতিতে নেমে সন্তানের বন্ধুবান্ধবদের 'মা' হয়ে ওঠেন তিনি। বিপ্লবের বিকাশের কারণে এই মা-ই হয়ে যান বিশ্ববিপ্লবীদের 'মা' তথা বিশ্বনির্যাতিত মানুষের মা।

মা' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট:

প্রতিটি উপন্যাসের প্রেক্ষাপট উপন্যাসটিকে যথার্থ হতে সহায়ক করে। 'মা' উপন্যাস এক্ষেত্রে আলাদা কোনো বিষয় নয়। আমরা প্রতিটি মানুষ জীবনবোধ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি। সেই শিক্ষা ও আদর্শ ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' উপন্যাসে বর্তমান। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর ড. মো. শহীদুর রহমানের আলোচনাটি যৌক্তিক-'মা' উপন্যাসে মূলত ধনতান্ত্রিক সমাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনার পরিবর্তে সম্মিলিত সংগ্রামী চেতনার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এতে লেখক শ্রমজীবী মানুষের জীবন প্রণালির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির কাঠামো গড়ে তোলার অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। বলা যায়, উপন্যাসে রুশ বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের উত্থানের বস্তুনিষ্ঠ চিত্র এখানে বিধৃত। এ সময় রাশিয়ার সমাজ এক নৈরাজ্যকে অতিক্রম করে অর্থবহ জীবনের অনুসন্ধান

করছিল। পুঁজিবাদী সমাজ যে কীভাবে সাধারণ মানুষকে শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ করছিল সে কথাই প্রস্ফুটিত হয়েছে 'মা' উপন্যাসের পড়তে পড়তে। এ উপন্যাসের সমালোচনায় বলা হয়েছে যে, বিশ্ব ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম প্রধান চরিত্র তথা নায়ক হিসেবে দাঁড়াল শ্রমিক মানুষ। আর গোর্কি হলেন এই নায়কের প্রতিনিধি এবং 'মা' উপন্যাস তার মাইলফলক।

'মা' উপন্যাসে দেখানো হয়েছে কীভাবে বিপ্লবী মানুষ নিষ্ক্রিয় অবস্থা থেকে সক্রিয় হয়। আর পুঁজিবাদের কল্যাণে শিল্পের বিকাশ হলেও মানবজীবন হয়ে ওঠে দুঃসহ। এ অবস্থায় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্কও নষ্ট হয়। এতে মানুষের তুলনায় যন্ত্রের প্রভাব হয় বেশি। তবে সংগ্রামীদের মধ্যে আত্মসমালোচনা, সংগ্রাম, বিপ্লবী চেতনা ও জাগরণের প্রভাব ক্রিয়াশীল হয় এবং তারা ক্রমান্বয়ে সার্বিক মুক্তিলাভ করতে পারে বলে উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই উপন্যাসের মাধ্যমে গোর্কি যেন গণবিপ্লবের কাজটি সমাধান করেছেন। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র 'মা', পাভেল নয়। 'মা' কে এখানে দেশমাতৃকার শ্রদ্ধায় উপস্থাপন করা হয়েছে। তাঁর মাতৃত্বকে খাটো করে দেখার কোনো উপায় নেই এবং তিনি পুত্রস্নেহের টানে নেতৃত্বে দিতে যেয়ে সবার মা হয়ে উঠেছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর স্থান যে পুরুষের উপরে এ কথাও উপন্যাসে প্রমাণিত। আমরা দেখছি রুশ সাহিত্য স্তেপনিয়াক-ক্র্যাভসিনস্কি প্রণীত 'নৈরাজ্যবাদী পেশা' উপন্যাসের মাধ্যমে বিপ্লব সূচনা করা হয়েছে এবং তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গোর্কির 'মা' উপন্যাসে। 'মা' উপন্যাসে পিতা ও পুত্রের দ্বন্দ্বকে প্রজন্মের দ্বন্দ্ব বলে দেখানো হয়েছে। এখানে বিপ্লব এবং মা'র মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। এ দিক থেকে এটি একটি রাজনৈতিক উপন্যাস হয়ে উঠেছে। এখানে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দেখানো হয়েছে। প্রতিটি চরিত্রই কোনো না কোনোভাবে পুঁজিবাদের দ্বারা আক্রান্ত এবং পুঁজিবাদবিরোধী। উপন্যাসে মানবতার দিকটিকেও অপরিসীম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্বও কম নয়। 'মা'-কে একটি বিপ্লবের প্রতীক হিসেবেও দেখা যায় উপন্যাসে। অতএব একে প্রতীকী উপন্যাসও বলা যায়। এজন্যই 'মা' উপন্যাসে সম্পর্কে লেলিন বলেছিলেন, "এটি একটি দরকারি বই। বহু মজুর বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন অচেতন ও স্বতঃস্ফুর্তভাবে, এবার 'মা' পড়ে তাদের মহা উপকার হবে। খুবই যুগোপযোগী বই।" অর্থাৎ পৃথিবীতে যত দিন শোষণ-পোষণ ও শ্রেণিদ্বন্দ্ব চলবে তত দিন 'মা' উপন্যাসের উপযোগিতা ফুরাবে না।"

হাঙ্গেরীয় লেখক এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য গেওর্গ লুকাচ (১৮৮৫-১৯৭১) ম্যাক্সিম গোর্কি সম্পর্কে বলেছেন, 'গোর্কি হলেন এমন এক মানুষ যার

মধ্যে অতীতের যথার্থ মূল্যবোধগুলোর সজীব সমন্বয় ঘটেছে। তিনি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় ঐতিহ্যের রূপকার, দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে সর্বহারা বিপ্লব, বিজয়ী সমাজতন্ত্র, সংস্কৃতির পুষ্পিত বিকাশের বন্যার স্পর্শযোগ্য অভিজ্ঞান... গোর্কিকে শ্রদ্ধা করা হয় বিপ্লব পূর্ব রাশিয়ার এক মহান সামাজিক ঐতিহাসিক হিসেবে, কারণ তিনি তৎকালীন রুশ সমাজের প্রতিটি অংশের কার্যকরী বিবর্তমান প্রবণতাগুলোকে আত্মস্থ করেছিলেন।' বিশ্বে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে, শান্তির স্বপক্ষে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। মৃত্যুর পূর্বে অচেতন অবস্থায় তাঁর শেষ বাণী- 'যুদ্ধ আসছে... আমাদের প্রস্তুত হওয়া দরকার।' পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লবী সাহিত্যিকদের তিনি ধ্রুবতারা। তাই ম্যাক্সিম গোর্কি ও 'মা' উপন্যাস আজও এবং আমৃত্যু পাঠক হৃদয়ে বেঁচে থাকবে।

ড. শামস্ আল্‌দীন
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

জীবনপঞ্জি :

১৮৬৮: মধ্যরাশিয়ার ভোল্গা নদীর তীরবর্তী নিঝ্‌ন নভ্‌গোরদ্‌ শহরে। বর্তমানে নাম গোর্কিতে ২৮ মার্চ গোর্কির
জন্ম। পারিবারিক নাম আলেক্সিয়েই ম্যাক্সিমভিচ্‌ পেশ্‌কভ্‌। বাবা ম্যাক্সিম্‌ স্যাভ্‌ভর্স্তভিচ্‌ পেশ্‌কভ্‌। মাৎ ভার্তারা ভালিলিয়েভলা পেশ্‌কতা। মাতামহ: ভাসিলি কাশিরিণ। মাতামহী: আকুলিনা ইভানভ্‌না কাশিরিনা।

১৮৭২: আস্ত্রাক্যানে কলেরায় গোর্কির পিতার মৃত্যু। মার হয় বিয়ে। ১১ বছর বয়সে মা মারা যান।

১৮৭৯-৮৪: [জীবনধারণের জন্য বিচিত্র কাজে হাতেখড়ি।]

১৮৮৪-৮৮: নিঝ্‌নি থেকে কাজানের বস্তিতে। নানা কাজে হাত পাকানো, গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী প্রচার চালান। উনিশ
বছর বয়সে দু-দুবার আত্যহত্যার ব্যর্থ চেষ্টা।

১৮৮৮-৯২: পর্যন্ত পায়ে হেটে রাশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল তিনি ঘুরে বেড়ান।

১৮৯২: প্রথশ গল্প 'মাকার চুদ্রা'-র প্রকাশ। ম্যাক্সিম গোর্কি ছদ্মনামে সাহিত্যিক জীবনে প্রবেশ।

১৮৯৬: একাতেরিনা পাভ্‌লভ্‌না ভোল্‌ঝিনা-র সঙ্গে বিয়ে। ১৯০৪ সাল পর্যন্ত তারা একসাথে থাকেন। বিচ্ছেদ
তাদের এক ছেলে ম্যাক্সিম জন্ম নেয় ৩০ জুলাই ১৮৯৭ ।
একাতেরিনার সাথে বিয়ে বিচ্ছেদ হয়নি কিন্তু গোর্কি মস্কো আর্ট থিয়েটারের অভিনেত্রী, বহুভাষাবিদ, বলশেভিক পার্টির সদস্য মারিয়া ফিও দরভ্‌না আন্দ্রেইয়েভোর সাথে প্রেমে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২০ পর্যন্ত তারা একসাথে থাকেন। মারিয়ার সাথে দূরত্ব তৈরি হয়। এর পর নগোর্কি প্রায় ৫২ বছর বয়সে মারিয়ার সাথে দূরত্ব তৈরি হয়। এরপর গোর্কি প্রায় ৫২ বছয় বয়সে মারিয়া বুড়্‌বার্গ নামে বলশেভিক পার্টির তুখোড় কর্মীর সাথে বসবাস করেন। পূর্বের স্ত্রীদের সাথে তার বিচ্ছেদ হয়নি। তাঁদের খোঁজখবর রাখতেন তিনি।

১৮৯৯: মার্চে টয়ল্টাতে চেখভ্‌ের ঘনঘন সাক্ষাত। প্রথম উপন্যাস 'ফোসা গর্দিয়েভ্‌' রচনা।

১৯০০: ১৩ জানুয়ারি মস্কোতে তলস্তয়ের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ।

১৯০১: 'ঝড়ের পাখির পেট্রোল' লেখেন। ১৭ এপ্রিল গ্রেপ্তার, ছাড়া পেয়ে গৃহবন্দী। স্বাস্থ্যের জন্যে ক্রিমিয়াতে

বিশ্রামের অনুমতি লাভ।

১৯০২: মস্কোতে 'ফিলিস্টাইনজ' এবং 'আরও নিচে' নাটকের অভিনয়।

১৯০৫: বিপ্লবী সংগ্রামে যোগদান, ১১ জানুয়ারী গ্রেপ্তার। মুক্ত হয়ে নজরবন্দী। নভেম্বরের পিটার্সবার্গে লেনিনের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ।

১৯০৬-১৩: প্রধানত থাকেন কপিতে। নভেম্বরে 'মা' উপন্যাস লেখা শেষ। ১৯০৭-এ লন্ডনে লেনিনের সাথে সাক্ষাৎ। ১৯১২-তে গোর্কিকে কমিউনিস্টদের 'প্রাভদা' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে লেনিনের অনুরোধ। ১৯১৩-তে রাশিয়ায় ফেরেন।

১৯১৩-১৬: 'ছেলেবেলা', শিক্ষানবিশ' লেখা সমাপ্ত।

১৯১৭: রুশ বিপ্লবর দিনগুলোতে মস্কোতে অবস্থান।

১৯২১: রোগে আক্রান্ত লেনিনের চেষ্টায় চিকিৎসার জন্য জার্মানিতে গমন।

১৯২৩-২৯: 'আমার বিশ্ববিদ্যালয়' 'আরটমনোভ্‌জ' 'ক্লিম সামগিনের জীবন' লেখা এবং অনুস্থ হয়ে ইতালিতে গমন।

১৯৩২: এ সারা দেশে গোর্কির জন্মদিন রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন।

১৯৩৪: নিখিল সোভিয়েত লেখক ইউনিয়নের ১ম সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। এ বছরই ১১ মে একমাত্র ছেলে ম্যাক্সিমের মৃত্যু।

১৯৩৬: চিকিৎসারত অবস্থায় আটষট্টি বছর বয়সে ১৮ জুন আকস্মিকভাবে মৃত্যু।

সংক্ষেপে উল্লেখযোগ্য রচনাপঞ্জি

উপন্যাস

অভাগা পাভেল। [গরেমিকা পাভেল্]। ১৮৯৪
অর্লোভ্ দম্পত্তি। [সুপ্রুগি অর্লোভি]। ১৮৯৭
ফম-গর্দেইয়েভ্। ১৮৯৯
ভারেন্কা অলিয়েসভা। ১৮৯৭-৯৯
ত্রয়ী। [ত্রোইয়ে]। ১৯০০
চাষাভুষো। [মুঝিক্]। ১৯০০
দ্বন্দ্বযুদ্ধ। [পয়েদিনক্]। ১৯০৫ ?
মা। [মাৎ]। ১৯০৬-৭
মফস্বল অকুরভ্। [গরদোক্ অকুরভ্]। ১৮৯৭
গ্রীষ্মকাল। [লিয়েত] ১৯০৯
ফালতু লোকের জীবন। [ঝিজ্ন্ নিনুঝ্নভ চেলভিয়েকা]। ১৯১০
মাৎভিয়েই কঝেমিয়াকিনের জীবন। [ঝিজ্ন্ মাৎভিয়েইয়া কঝেমিয়াকিনা]। ১৯১০-১১
সবই তো হল। [ফসিও তোঝে]। ১৯১৫
আর্তামোনভ্ বৃত্তান্ত। [দিয়েল আর্তামোনভিখ্]। ১৯২৫
ক্লিম্ সাম্গিনের জীবন। [ঝিজ্ন্ ক্লিমা সাম্গিনা]। ১৯২৭-৩৭

প্রথম ভাগ	১৯২৭
দ্বিতীয় ভাগ	১৯২৮
তৃতীয় ভাগ	১৯৩১
চতুর্থ ভাগ (অসমাপ্ত)	১৯৩৭

আত্মজৈবনিক রচনা

শৈশব। [দিয়েৎস্ ভ]। ১৯১৩-১৪
জনারন্যে [ফ্ লুন্দিয়াখ্]। ১৯১৫-১৬
আমার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। [মই-ই উইনভের্সিতিয়েতি]। ১৯২৩
(বাংলা অনুবাদে যথাক্রমে আমার ছেলেবেলা, পৃথিবীর পথে, পৃথিবীর পাঠশালায় শিরোনামে মস্কো থেকে, এবং এখন আমাদের দেশ থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে বহুকাল যাবৎ।]

নাটক	গল্প
নিচুতলার মানুষ। [না দ্নিয়ে] ১৯০২	মাকার্ চুদ্রা ১৮৯২
পাতিবুর্জোয়া। মেশ্শানে] ১৯০২	মানুষের জন্ম ১৮৯২
মরসুমী লোক। [দাচ্নিকি] ১৯০৪	বুড়ি ইজের্গিল্ ১৮৯৪
শত্রুপক্ষ। [ভ্রাগি]। ১৯০৬	চেল্কাশ্ ১৮৯৪
বুড়ো হাবড়া। [চুদকি]। ১৯১২	কনভালভ্ ১৮৯৫
ভাসা ঝেলেজ্নোভা। ১৯৩৬	বোলেস্লভ্ ১৮৯৬
	ছাব্বিশ জন ও এক মেয়ে ১৮৯৯

প্রথম খন্ড

১

রোজ রোজই সেই এক– সেই ভোর না হতেই কারখানার বাঁশিটার কাঁপা কাঁপা বিশ্রী চিৎকার... কুলি-বস্তির ধোঁয়াটে তেলচিটে আকাশটা আঁতকে ওঠে। পেশিগুলো চাঙা হয়ে ওঠার আগেই সেই ডাকে সাড়া দিয়ে গুমোট ঝাপসা অন্ধকারে ঘুম ভেঙে ধড়ফড় করে উঠে হাইরঙা খুপরিগুলো থেকে অন্ধকার মুখে মানুষগুলো বেরিয়ে আসে ভয়-খাওয়া আরশোলার মতো। কন্‌কনে ঠাণ্ডা; শেষ রাতের আঁধার তখনও লেগে থাকে ভোরের গায়ে। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তাটা দিয়ে চলে ওরা। কারখানার উঁচু উঁচু পাথুরে খুপরিগুলো ওদেরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে নির্বিকার আত্মপ্রত্যয়ে। তাদের সার-বাঁধা চৌকো চৌকো তৈলাক্ত চোখের আলো পড়ে এঁদো রাস্তাটার ওপর। মানুষগুলোর পায়ের তলায় কাদা ছপ্‌ছপ্‌ করে। কর্কশ, মোটা, ঘুম-জড়ানো কণ্ঠের গালাগালি আর খিস্তির তোড়ে বাতাস বিদীর্ণ হয়। তাদের দিকে ভেসে আসে আরো নানা শব্দ– কারখানার যন্ত্র-দানবের গর্জন আর বাষ্পের ভস্‌ভসানি। কুলি-বস্তির ওপরে মাথা উঁচিয়ে থাকে বিরস কালো চিমনিগুলো, মোটা মোটা উঁচানো গদার মতো।

তারপর যখন সন্ধ্যে হয়, পড়ন্ত সূর্যের ক্লান্ত ছায়া এলিয়ে পড়ে জানলায় জানলায়, পোড়া-কয়লার ছাইয়ের মতো করে কারখানাটা তার পাথুরে ভুঁড়ি থেকে মানুষগুলোকে উগ্‌রে ফেলে। আবার সেই নোংরা রাস্তা বেয়ে কালিঝুলি মাখা কালো কঠোর মুখের মিছিল; ক্ষুধার্ত ঠোঁটের ফাঁকে দাঁতগুলো ঝিলিক দেয়। কলের তেল কালির গন্ধ বেরোয় চট্‌চটে গা দিয়ে। কিন্তু এবেলা ওদের গলার স্বরে ফুর্তির, এমনকি আনন্দের সুর– আজকের মতো খাটুনি সারা। এখন ঘরে ফিরে, রাতের খাবার খেয়ে শরীরটা এলিয়ে দেওয়া।

ওদের দিন গিলে খায় কারখানাটা, আর দেহের শক্তি নিংড়ে নিংড়ে যতটা পারে শুষে নেয় যন্ত্র-দানব। এমনি করে দিন যায়– একেবারে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, আর এক পা করে মানুষগুলোপা এগোয় কবরের দিকে। কিন্তু তা হোক– এখনকার মতো ত দেহটা বিশ্রাম পাবে। সেই আশায়, আর ধোঁয়া-ভরা মদের আড্ডার কল্পনায় ওরা এখন মশগুল।

রবিবার দিন ঘুম ভাঙতে বেলা দশটা। বিয়ে-থাওয়া-করা সংসারী গেরস্ত গোছের যারা, তারা উঠে পোশাকী কাপড় পরে গির্জায় যেতে-যেতে ধর্মে মতি

নেই বলে গাল দিতে থাকে ছেলে-ছোকরাদের। উপাসনার পর বাড়ি ফিরে পিঠে-টিঠে খেয়ে আবার লম্বা ঘুম সেই সন্ধ্যে অবধি।

বছরের পর বছর হাড়ভাঙা খাটুনিতে দেহটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে ওদের খিদে মরে যায়। মদ খেয়ে ভোঁতা খিদেটাকে শান দিতে যায়। কিন্তু কড়া ভদ্‌কার ঝাঁঝে পেটের নাড়িগুলো চিড়বিড়িয়ে ওঠে।

সন্ধ্যের সময় একটু বেড়াতে যায় অলস পায়ে। বেরোবার সময় গালশ থাকলে ওটাই পরে বেরোবে, হোক না রাস্তা খট্‌খটে শুকনো। আর ছাতা থাকলে বৃষ্টি না পড়লেও তা সঙ্গে নিয়ে বেরোনো চাই।

কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হলে সেই একই কথা– কারখানা, যন্ত্র আর ফোরম্যানের বাপান্ত। কাজ ছাড়া ওদের কোনো কথা নেই, কোনো চিন্তা নেই। পানসে, একঘেয়ে দিন। এরই মধ্যে কদাচিৎ এক-আধটা, অতি ক্ষীণ, ভীরু চিন্তার ফুল্‌কি ঝলক দিয়ে যায়। বাড়ি ফিরে ঝগড়া লাগে বৌ-এর সঙ্গে, প্রায়ই ঠেঙায় তাকে, ঘুষি মারতে ছাড়ে না। চ্যাংড়ারা শুঁড়িখানায় যায়, অথবা বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি আড্ডা দেয়, – অ্যাকর্ডিয়ন বাজিয়ে অশ্লীল গান গায়, নাচে, গালাগালি দেয় আর কষে মদ খায়। খাটুনিতে অবসন্ন দেহটা সইতে পারে না, নেশা ধরে সহজেই, কী যেন একটা অজানা অস্থির জ্বালা বুকের মধ্যে জ্বলতে থাকে সবকিছুর তলায়, বেরোবার পথ চায়। তাই মনের জ্বালায় সামান্য কারণেই তারা খেয়োখেয়ি করে পাশব হিংস্রতায়, কথায় কথায় হাতাহাতি, রক্তারক্তি, হাত-পা-মাথা ভাঙা, কখনো কখনো খুনোখুনি পর্যন্ত।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটুকু ওদের বেলায় কী যেন এক বিদ্বেষে বিষিয়ে থাকে, যে কোনো মুহূর্তে ফেটে বেরিয়ে পড়ে। ও বিষ ঝেড়ে ফেলা যায় না; ওটা ওদের দেহের অনপনেয় ক্লান্তির মতোই। বাপ থেকে বেটায় সংক্রামিত হয় সে বিষ, কালো ছায়ার মতো একেবারে কবর পর্যন্ত অনুসরণ করে। ওই বিষের জ্বালায়ই ওরা অযথা ক্রূর জঘন্য সব অপরাধ করে থাকে।

রবিবারগুলোয় ছোকরারা অনেক রাত্তিরে বাড়ি ফেরে ছেঁড়া কাপড়ে, সর্বাঙ্গ ধুলো-কাদা মাখা, কালশিটে-পড়া-চোখ, জখমি নাক; কখনও আবার বন্ধুদের ঠেঙিয়ে এসে বিদ্বেষের সঙ্গে আস্ফালন করে, আর নয়তো গুঁতোনি খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে আসে, গোমড়া মুখে গজরায়; মাতাল, করুণ, অসহায়, ন্যাক্কারজনক কতকগুলো মানুষ। কোনো কোনো দিন ছেলেরা বাড়িই ফেরে না; পাঁড় মাতাল হয়ে পড়ে থাকে রাস্তার ধারে বা বেড়ার আড়ালে, নয়তো আড্ডাখানার মেঝেতে। বাপ-মা খুঁজে পেতে কুড়িয়ে আনে, যাচ্ছেতাই করে গালিগালাজ করে, ভদকা-ঠাসা অসাড় গতরগুলোর উপর লাগায় ঠ্যাঙানি। কম-বেশি যত্নশীল যে-সব মা-বাপেরা, তারা ধরে নিয়ে বিছানায় ফেলে ওদের,

যাতে পরের দিন সাত সকালে কারখানার ক্রুদ্ধ বাঁশিটা যখন ভোরের আলো ঠেলে আঁধারের ঢেউয়ের মতো তেড়ে-ফুঁড়ে এগিয়ে আসে, তখন আবার ওদের তুলে দিতে পারে।

বড়রা রাগ করে, ছেলেদের পেটায়ও বটে, কিন্তু ওদের মাতলামি আর মারামারিটা অস্বাভাবিকভাবে না। নিজেরাও করেছে যখন চ্যাংড়া ছিল; বাপ-মায়ের কাছে এমনি ঠ্যাঙ্গানিও তাই খেয়েছে। এমনিভাবেই তো চলে এসেছে ওদের জীবন– একটানা ঢিমে ঢিমে স্রোতে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে বছরের পর বছর তার ঘোলা জল সবই বাঁধা পড়ে আছে নিত্যই একই কাজ করার, একই কথা ভাবার আদ্যিকালের, পুরনো সেই চাল-চলন আর রীতিনীতির কঠিন পাড়-বাঁধা হয়ে। সে স্রোত বদলাবার বাসনা কারও নেই।

মাঝে মাঝে বস্তিতে ভিনদেশ থেকে মানুষজন আসে। গোড়ার দিকে তারা স্রেফ ভিনদেশি বলে বাসিন্দাদের আগ্রহ জাগায়। তারপর তাদের আগেকার কাজের জায়গার গল্প বলে ভাসা ভাসা অস্পষ্ট এক ধরনের আগ্রহ জাগিয়ে রাখে। পরে ধীরে ধীরে নতুনের রং খসে, গল্পও পুরনো হয়; লক্ষ করার মতো বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না সেগুলোর মধ্যে। তাদের বৃত্তান্ত থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সাধারণ মজুরদের জীবন সর্বত্রই সেই এক থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বাড়ি-থোড়া। তা-ই যদি হয়, তা নিয়ে গল্প করার কী আছে?

কিন্তু কেউ কেউ আবার নতুন কথাও বলে। সাতজন্মে কেউ শোনেনি এমন সব কথা। কেমন যেন সন্দেহ হয়। তবু শোনে প্রত্যেকেই, তর্ক করে না। কেউ চটেও যায়, কারুর মনে আবার কিসের জানি শঙ্কা জাগে। কী যেন একটা আশার আবছা ছায়াও দোলা দিয়ে যায় কারুর মনে। অস্থির আশঙ্কা ভোলার জন্য ওরা আরো বেশি করে মদ খায়।

দশের থেকে একটু আলাদা কেউ হলেই ওরা সন্দেহের চোখে দেখে। সে সন্দেহের কারণ তাদের অজানা। যেন ভয় পায়– হোক পানসে জোলো, কিন্তু মোটের ওপর একটা ধারায় চলছে তো জীবনটা। কে জানে কী ঝামেলা বাঁধাবে ওইসব লোকগুলো। নাই বা থাক সুখ, স্বস্তি তো আছে। জীবনের ভারী বোঝাটা একইভাবে বয়ে এনেছে ওরা। বইছে, বইবে। জেনে রেখেছে ও থেকে মুক্তি নেই। আর মুক্তিই যদি নেই, তবে হেরফের হলে দুঃখ বাড়বে বই কমবে না।

অতএব যারা নতুন কথা বলে, ওরা চুপচাপ তাদের পাশ কাটিয়ে যায়। নয়া মানুষগুলো অন্য কোথাও চলে যায়। কেউ কেউ কারখানায় কাজ নিয়ে থেকেও যায় কিন্তু গড্ডলিকা প্রবাহে মিশে যেতে না পেরে থাকে একপাশে। ...

এমনি করে গোটা পঞ্চাশ বছর কোনোমতে বেঁচে থেকে লোকগুলো একে একে মরে যায়।

২

মিখাইল ভাসভ-এর জীবনটাও এই একই রকমের। লোমশ শরীর; এই এতখানি পুরু ভুরুর তলায় কুতকুতে চোখ-জোড়া দিয়ে দুনিয়াটাকে ও দেখে সন্দেহ আর অবহেলার দৃষ্টিতে। কারখানার সেরা মিস্ত্রি ও, বস্তিতে ওর জুড়ি নেই গায়ের জোরে। কিন্তু ওপরওলার সাথে ব্যবহারটা কর্কশ বলে রোজগারটা বেশি হয় না। তারপর ছুটির দিনে ও কাউকে না কাউকে ধরে ঠ্যাঙাবেই। কাজেই কেউ ওকে দেখতে পারে না। ভয়ে ওর কাছে ঘেঁষেই না কেউ। পাল্টা ঠ্যাঙানি দেবার চেষ্টা করেছে কেউ কেউ, কিন্তু পেরে ওঠেনি। কাউকে তেড়ে আসতে দেখলেই হণো ভাসভ ইট, পাথর, কাঠ, লোহা, হাতের কাছে যা পাবে তুলে নিয়ে দু-পা ফাঁক করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে তাক করে। ওই লোমশ হাত আর চোখ থেকে ঘাড় পর্যন্ত কালো দাড়ি-ছাওয়া মুখ দেখলেই লোকের পিলে চমকে উঠত। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হলো ওর খুদে খুদে ধারালো চোখ দুটোর দৃষ্টি, যেন ছুঁচলো লোহার মতো মানুষকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেয়। সে কী চেহারা তখন ওর– যেন ভয়লেশহীন নির্মম হিংস্র বুনো জানোয়ারটা ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় গর্জায় : ‘পালা বলছি, শালা, কুত্তীর বাচ্চা! পালা!’ চাপা দাড়ির ফাঁক দিয়ে হলদে বড় বড় দাঁতগুলো ঝিলিক মারে। ও-পক্ষের আত্মারাম তখন প্রায় খাঁচা-ছাড়া। গাল দিতে দিতে তারা গুটি গুটি পালায়।

তুরপুনের মতো তার ধারালো দুই চোখে বিদ্রুপের হাসি ঝিলিক মারে। সংক্ষেপে সে বলে :

‘কালা কুত্তীর বাচ্চা!’ মাথা খাড়া করে এগিয়ে যায়, তারপর চিৎকার করে বলে, ‘আয় না দেখি, কোন্ শালার মরার সাধ হয়েছে...’

ও সাধ কারো নেই।

ভাসভ কথা বড় একটা কয় না। পুলিশ হোক, বড় বড় অফিসার, ওপরওলা যেই হোক, সব্বাইকে বলে কুত্তীর বাচ্চা। ওটা ওর মুখের বুলি। বৌকে কুত্তী ছাড়া ডাকে না।

‘এই কুত্তী! আমার প্যান্টটা ছিঁড়ে একশা হলো যে...’

ছেলে পাভেলের তখন চোদ্দ বছর বয়েস। বাপ কেন জানি একদিন তেড়ে এসে ঝুঁটি ধরতে গেল তার। ছেলে একটা ভারি হাতুড়ি তুলে বলল :

‘গায়ে হাত দিয়েছ তো...’

বার্চ গাছের ওপর মেঘের ছায়া যেমন উদ্যত হয় তেমনিভাবে ছেলের দীর্ঘ পাতলা দেহটার সামনে খাড়া হয়ে ভাসভ বলল, ‘অ্যাঁ এদ্দুর!’

হাতুড়ি ওঠায় পাভেল, 'বাস্, ঢের গুঁতোনি খেয়েছি, আর না!'

ছেলের দিকে একবার তাকিয়ে লোমশ হাত দুখানা পেছনে মুড়ে নিল ভ-াসভ। কাষষ্ঠ হাসি হেসে বলল :

'আচ্ছা, আচ্ছা...'

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে যোগ করল :

'সাধে কি আর কুত্তীর বাচ্চা বলি...'

কিছুক্ষণ পরে বৌকে গিয়ে বলল :

'আমার কাছে আর টাকা-পয়সা চাইবি না। তোর ছেলের অন্ন খাবি এখন থেকে...'

সাহস করে জবাব দেয় বৌ, 'আর তুমি টাকাগুলো মদের গেলাসে ফুঁকবে, তাই না?'

'তোর তাতে কী রে, কুত্তী! আমি মেয়েমানুষ রাখব...'

মেয়েমানুষ রাখেনি ও। কিন্তু এরপর যে দুটো বছর বেঁচে ছিল ছেলের সঙ্গে একটি কথাও কয়নি আর তাকে যেন দেখতেও পায়নি।

একটা কুকুর ছিল ভাসভের, মালিকের মতোই তার বিরাট লোমশ দেহ। প্রতিদিন যাবার সময় কারখানা পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে যেত আর সন্ধ্যেবেলায় গেটের সামনে গিয়ে প্রভুর অপেক্ষায় বসে থাকত। ছুটির দিনগুলো শুঁড়িখানায় ঘুরে ঘুরে বেড়াত ভাসভ। কথা বলত না কারো সঙ্গে, কেবল মানুষের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আঁচড় দিত যেন খুঁজছে কাউকে। কুকুরটা তার ঝাঁকড়া লেজ ঝুলিয়ে দিনমান প্রভুর পায়ে পায়ে ঘুরত। রাতে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরে ভাসভ খেতে বসে নিজের পেয়ালায় খাওয়াত কুকুরটাকে। কোনোদিন ওটাকে গাল দেয়নি, ধরে ঠ্যাঙায়নি, অথচ আদরও করেনি। খাবার পর বাসনকোসন সরাতে স্ত্রীর যদি একটু দেরি হয়েছে, টান মেরে সব মেঝেতে ফেলে দিয়ে এক বোতল ভদ্‌কা সামনে নিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে, চোখ বুজে, মুখ এতখানি হাঁ করে গান জুড়েছে। সে কী গান! সেই একঘেয়ে হেঁড়ে গলায় আঁতকে উঠত মানুষ। কুৎসিত আওয়াজটা গলা থেকে বেরিয়ে এসে গোঁফের সঙ্গে যেন জড়িয়ে যেত, খাওয়া রুটির গুঁড়োগুলো বেরিয়ে আসতে চাইত ওর গানের ঠেলায়। বসে বসে মোটা মোটা আঙুল দিয়ে দাড়ি-গোঁফে বিলি কাটত আর গান গেয়ে যেত একমনে। গানের কথা একটিও বোঝা যেত না। টানা টানা সুরটা শীতের রাতে নেকড়ে বাঘের কান্নার কথা মনে করিয়ে দিত। যতক্ষণ বোতলে ভদ্‌কা থাকত ততক্ষণ গান চলত। তারপর হয় বেঞ্চিতে এলিয়ে পড়ত, নয়তো টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ত; গভীর একটানা ঘুম, সেই যতক্ষণ না ভোরবেলায় কলের বাঁশি বাজে। কুকুরটা ওর পাশে শুয়ে ঘুমাত।

লোকটা মারা গেল একটা নাড়ি ছিঁড়ে। পাঁচদিন বিছানায় পড়ে ছটফট করল। মুখটা কালি মেরে গিয়েছিল। চোখ সজোরে বন্ধ করে দাঁতগুলো কড়মড় করত আর থেকে থেকে বৌকে বলত :

'দে, দে সেঁকো বিষ দে...মেরে ফেল্ আমায়...'

ডাক্তার বলে গেল, পুল্টিশ লাগাও। আর একটা অপারেশন করতে হবে, আজই রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।

হাঁপাতে হাঁপাতে মিখাইল বলল, 'শালা কুত্তীর বাচ্চা! তোর কেরদানি ছাড়াই মরতে পারব। ভাগ শালা!'

ডাক্তার চলে গেলে স্ত্রী চোখের জলে ভেসে বহু কাকুতি-মিনতি করল অপারেশন করাবার জন্য। মিখাইল স্ত্রীর দিকে মুঠি বাগিয়ে বলল শুধু, 'দাঁড়া ভালো যদি হই, তোকে মজাটা দেখাব!'

সকালবেলা কারখানার বাঁশিও বাজল, আর মিখাইলও চোখ বুজল চিরদিনের মতো। কফিনে শুল মিখাইল, মুখটা খোলা, ভুরু দুটো রাগে কোঁচকানো। ওর বৌ, ছেলে, কুকুরটা, দানিলা ভেসভশ্চিকভ (একটা দাগী চোর, মাতাল; কারখানা থেকে বিতাড়িত), আর বস্তি থেকে জনকয় ভিখারি গিয়ে ওকে কবর দিয়ে এলো। বৌটা নিঃশব্দে একটুখানি কাঁদল। পাভেল কাঁদল না। রাস্তায় কফিন দেখে লোকে থেমে পড়ে বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন করে বলাবলি করতে লাগল :

'পেলাগেয়া এবার বাঁচল!'

কয়েকজন বলল, 'যেমন কুকুর ছিল, তেমনি কুকুরের মতোই টেঁসে গেছে!'

কবর দেওয়া হয়ে গেলে সবাই চলে গেল কিন্তু কুকুরটা সেই খোঁড়া মাটির ওপর বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে কবরটা শুঁকতে লাগল। কদিন পরে কে যেন মেরে ফেলল কুকুরটাকে।...

৩

বাপ মারা যাবার সপ্তাহ দু-এক পরে এক রবিবার সাংঘাতিক মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরল পাভেল ভাসভ। টলতে টলতে ঘরে ঢুকে ঘরের মাথার দিককার চেয়ারটায় ধপ্ করে বসে পড়ে বাপের মতো করে টেবিল পিটিয়ে চিৎকার করে হুকুম করল মাকে, 'খানা লাও!'

কাছে এসে পাশের চেয়ারে বসে মা দুই হাতে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরল। মা'র কাঁধে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিয়ে পাভেল বলে উঠল :

'যাও যাও, জলদি কর!'

ছেলের প্রবল আপত্তি সামলে সস্নেহে বেদনার্ত স্বরে মা বলল, 'হাঁরে বোকা ছেলে!'